SAMSAPTAK
e-ISSN: Applied for (Online)
OPEN ACCESS An International Multidisciplinary Journal
Double-Blind Peer-Reviewed
(Arts, Social Sciences & Humanities)
Vol.1, Issue- 1, January -2026

বাংলা সাহিত্যে কারা উপন্যাসঃ বিশ্লেষণের আলোকে ‘জাগরী’ ও ‘হন্যমান’

ডঃ চন্দনা চক্রবর্তী

Assistant Professor, Department of bengali

Govt General Degree College Nakashipara.

ORCID
https://orcid.org/0000-0001-1959-1651

e-mail- **chandanachakraborty1000@gmail.com**

Received Date- 29.11.2025

Selection Date 20.01.2026

Page- 26 – 35

Keywords

কারা উপন্যাস,
চেতনাপ্রবাহমূলক রীতি,
রাজনৈতিক জাগৃতি,
জেল জীবন,
আত্মবিশ্লেষণ,
হন্যমান,
পাশবিক অত্যাচার,
সাতের দশক

Abstract-

*The name of 'Jagari' immediately comes to mind as the **first and one of the foremost** works among prison-centric novels. Taking 'Jagari' as the pioneer and appreciating its excellence, one can read another prison novel, **'Hanyaman'**. This modern novel is based on writer Jaya Mitra's own experience of serving time in prison. On one hand, 'Hanyaman' takes its inception from 'Jagari', giving a new dimension to its flow and advancing that trend with dignity. The aforementioned essay discusses these two prison novels.*

In the introduction to the novel 'Jagari', Satinath wrote:

"The conflict of various political ideologies is inevitable with political awakening. The wave of this turmoil and upheaval is also striking at the foundation of family life in some places—this is the story of one such family. The story should be read against the backdrop of the August Movement in 1942. The book's objective is not to campaign against any political party."

On the other hand, 'Hanyaman' is a collage of jail life seen through a woman's eyes. It is a watercolor portrait of the lives of the various girls who were incarcerated, and the pathetic stories behind their arrival in jail. Satinath's 'Jagari' is a novel about four members of a family set against the backdrop of the Second World War. Through their self-narration and description of their circumstances, the author has painted a piece of India.

SAMSAPTAK
e-ISSN: Applied for (Online)
OPEN ACCESS An International Multidisciplinary Journal
Double-Blind Peer-Reviewed
(Arts, Social Sciences & Humanities)
Vol.1, Issue- 1, January -2026

Main Discussion

বাংলা কথাসাহিত্যের বিরাট আকাশে রাজনৈতিক কথাকারের সংখ্যা সীমিত। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সরব উপস্থিতি এবং তাঁর রাজনীতি সংক্রান্ত কালজয়ী সৃষ্টি সম্ভারের কথা স্মরণে রেখেও বলা যায়, পরবর্তী ক্ষেত্রে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও সতীনাথ ভাদুড়ী মূলতঃ রাজনৈতিক কথাকার। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বাংলা কথাসাহিত্যের অগ্নি পরীক্ষার সময়। যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, গণবিক্ষোভ, দেশবিভাগজাত স্বাধীনতা- এগুলিই এই সময়ের উপন্যাসের বিষয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও পরবর্তীকালের গণবিক্ষোভের পটে লিখিত উপন্যাস হল সতীনাথ ভাদুড়ীর 'জাগরী', তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ঝড় ও ঝরাপাতা' মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'চিহ্ন'। এই উপন্যাসগুলির মধ্যে 'জাগরী' (১৯৪৫) হল অন্যতম সেরা কারা উপন্যাস। Irving Hoe রাজনৈতিক উপন্যাস সম্পর্কে বলেছেন-" The political novel is peculiarly a work of internal tension. To be novel at all, it must contain the usual representation of human behavior and feeling yet it must also absorb into its stream of movement the hard and perhaps insoluble pellets of modern ideology."[১] (Politics and the Novel) "জাগরী" উপন্যাসের মধ্যে এই জাতীয় উত্তেজনা ও উদ্বেগ রয়েছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর বাংলা সাহিত্যে সতীনাথ ভাদুড়ীর মতো শক্তিশালী ঔপন্যাসিক খুব কম। 'বাংলা উপন্যাসের কালান্তর' গ্রন্থে সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন " সতীনাথই বোধ করি শেষ মননদীপ্ত লেখক যিনি কলকাতা এবং কলকাতাইয়া মধ্যবিত্তকে তাঁর উপন্যাসে ব্যবহার করেননি। অথচ সব দিক দিয়ে তিনি আধুনিকেরও আধুনিক। 'জাগরী', 'চিত্রগুপ্তের ফাইল', 'অচিন রাগিনী', ঢোঁড়াই চরিত মানস', 'দিগভ্রান্ত'- সতীনাথের প্রতিটি উপন্যাসের পৃথক আঙ্গিক বৈশিষ্ট্য তাঁর আধুনিক জীবন সচেতনতা ও বিষয় অনুধাবনের অন্তহীন প্রয়াসের ফল।"[২]

'ভাব, বিষয়, তত্ত্ব সাধারণ মানুষের... কিন্তু রচনা লেখকের সম্পূর্ণ নিজের। সেজন্য রচনার মধ্যেই লেখক যথার্থ রূপে বাঁচিয়া থাকেন।' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই উক্তি সতীনাথ ভাদুড়ীর ক্ষেত্রে ভীষণ রকমের সত্যি। শুধু সতীনাথ কেন আধুনিক সাহিত্যিকদের জন্য প্রাসঙ্গিক। সতীনাথ এক অগ্নিগর্ভ সময়ে দাঁড়িয়ে এই কারা উপন্যাসটি লিখেছিলেন। আজও কারাগার কেন্দ্রিক উপন্যাস হিসেবে প্রথম এবং অন্যতম রচনা বলতে 'জাগরী'র নামটিই মনে আসে। 'জাগরী'কে পুরোধা হিসেবে রেখে এর উৎকর্ষকে প্রণিধান করে পাঠ করা যায় আরেকটি কারাগারের উপন্যাস 'হন্যমান'। এই আধুনিক উপন্যাসটি লেখিকা জয়া মিত্রের নিজের কারা জীবন যাপনের অভিজ্ঞতা সঞ্জাত। একদিকে 'জাগরী'র সূত্রপাত, তার ধারাকে নবীনত্ব দান করেছে, মর্যাদার পথে সেই ধারাকে এগিয়ে নিয়ে গেছে 'হন্যমান' উপন্যাসটি। উক্ত প্রবন্ধে এই দুটি কারা উপন্যাস নিয়েই আলোচনা করা হয়েছে।

SAMSAPTAK
e-ISSN: Applied for (Online)
OPEN ACCESS An International Multidisciplinary Journal
Double-Blind Peer-Reviewed
(Arts, Social Sciences & Humanities)
Vol.1, Issue- 1, January -2026

'জাগরী' উপন্যাসের ভূমিকায় সতীনাথ লিখেছেন –"রাজনৈতিক জাগৃতির সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন রাজনৈতিক মতবাদের সংঘাত অবশ্যম্ভাবী। এই আলোড়নের তরঙ্গ বিক্ষোভ কোনো কোনো স্থলে পারিবারিক জীবনের ভিত্তিতেও আঘাত করিতেছে- এইরূপ একটি পরিবারের কাহিনি। গল্পটি ১৯৪২ সালে আগস্ট আন্দোলনের পটভূমিকায় পড়িতে হইবে। কোনো রাজনৈতিক দলের বিরুদ্ধে প্রচার করা বইখানির উদ্দেশ্য নয়।" অন্যদিকে 'হন্যমান' নারীর চোখে দেখা জেল জীবনের কোলাজ। জেলে থাকা বিভিন্ন মেয়েদের জীবনের জলছবি। জেলে আসার পিছনের করুণ কাহিনি। সতীনাথের 'জাগরী' দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিকায় একটি পরিবারের চার জনকে নিয়ে উপন্যাস। তাদের আত্মকথন, তাঁদের পরিস্থিতি বর্ণনার মধ্য দিয়ে একটুকরো ভারতবর্ষকে এঁকেছেন লেখক।

অন্যদিকে কবি জয়া মিত্রের প্রসঙ্গে আসি। কবি জয়া মিত্র সাতের দশকে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলে বন্দি হয়ে সাড়ে চার বছর কাটিয়েছেন। সেই জেল জীবনের অভিজ্ঞতা 'হন্যমান'। তবে গ্রন্থটি শুধুমাত্র ব্যক্তিগত বন্দী জীবনের স্মৃতিমাত্র নয়, ব্যক্তি মানুষের যন্ত্রণার সীমাকে ছাড়িয়ে সমগ্র মানব পটভূমির আর্তির অপরিসীমে ব্যাপ্ত হয়েছে এর সংকেত। সাতের দশকে বন্দী হতে হয়েছিল লেখিকাকে। জেল সম্পর্কে ভয়, অজ্ঞতা, অপরিচয় কেটে গিয়েছিল জেলে বন্দীত্ব দশা কাটাতে গিয়ে। ধীরে ধীরে দিন বদলালো। 'শ্মশান, ও পুনরায় ঘাসজমি হয়ে ওঠা শান্তি ফিরে এলে, যারা কারাপ্রাচীরের বাইরে এসে দাঁড়ালেন, তাদের অনেকে লিখলেন জীবনের সেই অন্ধকার অংশের কথা --- অত্যাচার,পাশবিকতা, হত্যা ও নির্মম বীভৎসতার সেইসব স্মৃতি।"[৪] জয়া মিত্র যেমন জেল থেকে বেরোনোর পর বিরাট অভিজ্ঞতার ঝুলি নিয়ে এসেছিলেন। জেলের ভিতরে হওয়া অত্যাচার, নির্মম পরিণতি, বন্দীদের ন্যুনতম সুযোগ সুবিধার অভাব, বন্দীদের প্রতি অমানবিক আচরণ, বন্দী হয়ে আসার পিছনে থাকা করুণ কাহিনি- সব কিছুই অত্যন্ত মর্মস্পর্শীভাবে বর্ণনা করেছেন লেখিকা।

সতীনাথ ভাদুড়ী যখন 'জাগরী' উপন্যাসটি লেখেন তখন বাংলায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী উত্তপ্ত অবস্থা। উপন্যাসটি লিখেও ছিলেন কারাগারে বসেই।'জাগরী' উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি ফণীশ্বরনাথ রেনু জেলে বসেই পড়েছিলেন। সেই পাঠের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে লিখেছিলেন— " সেই টি-সেলে বসে 'জাগরী'র পাণ্ডুলিপি পড়বার কথা চিরদিন মনে থাকবে। বিলুর অধ্যায়- ফাঁসি সেল- পড়তে পড়তে কয়েকবার মনে হয়েছিল আজ ভোরবেলায় আমার ফাঁসি হবে।"[৫] রাজনৈতিক জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাকে ভাষ্যদীপিত করার অভিপ্রায় নিয়েই সতীনাথ 'জাগরী' লিখেছিলেন। উপন্যাসটি চারটি অধ্যায়ে সম্পূর্ণ—'ফাঁসি সেল' , 'আপার ডিভিসন ওয়ার্ডঃ বাবা' , 'আওরৎ কিতাঃ মা' , 'জেলগেটঃ নীলু'। ঔপন্যাসিক একটি বিশেষ রাত্রিতে চারটি চরিত্রের আত্মচারণার মধ্যে দিয়ে পরাধীন ভারতবর্ষে রাজনৈতিক মতাদর্শের ঘাত-প্রতিঘাতে তাদের চারজনের মধ্যকার সম্পর্ক সূত্রের টানাপোড়েন গ্রথিত করেছেন।

'জাগরী'র কাহিনিতে উপস্থাপিত হয়েছে ১৯৪৩ সালের মে মাসে এক রাতে পূর্ণিয়ার জেলে কারারুদ্ধ অবস্থায় রয়েছে তিনটি চরিত্র বিলু, আপার ডিভিশনে বাবা, আওরৎ কিতায় মা এবং বাইরে জেলগেটে নীলু।

SAMSAPTAK
e-ISSN: Applied for (Online)
OPEN ACCESS An International Multidisciplinary Journal
Double-Blind Peer-Reviewed
(Arts, Social Sciences & Humanities)
Vol.1, Issue- 1, January -2026

বিলু ফাঁসির আসামী। পরের দিন ভোরে বিলুর ফাঁসি হবে। আগের রাতে বিলুর আত্মজিজ্ঞাসা দিয়ে উপন্যাসের সূচনা হয়েছে। বিলুর বাবাও ছেলের ফাঁসির আগের দিন রুদ্ধশ্বাস মুহূর্তে আত্মবিশ্লেষণে মগ্ন। মা রয়েছে আওরৎ কিতায়। মাঝে মাঝেই অসুস্থ হয়ে পড়ছেন। ছোটবেলা থেকে দুটি ছেলেকে মানুষ করার জীবনযুদ্ধের কথা মনে করে। আসন্ন সন্তান হারানোর বেদনায় দগ্ধ হচ্ছে তার মন। দাদার দেহ নেওয়ার জন্য জেলগেটের বাইরে দাঁড়িয়ে ছোটভাই নীলু।

ষোলো পা লম্বা, দশ পা চওড়া একটা ঘর। সম্মুখের দিকে মোটা লোহার গরাদের দরজা। দক্ষিণ দেওয়ালে ছাতের কাছাকাছি একটি ছোট গবাক্ষ। ঘরের মধ্যে আসবাব বলতে দুটি আলকাতরা মাখানো মাটির মালসা, এটাই ছিল বিলুর সলিটারি সেল। সেলের ঠিক পশ্চিমেই ফাঁসির মঞ্চ। ফাঁসি হবে বিলুর। সে জানে। প্রথম প্রথম মন দুর্বল হয়ে পড়ত। ফাঁসির সমস্ত দৃশ্য তার চোখের সামনে ভেসে উঠত। ধীরে ধীরে ফাঁসির কথাও সয়ে গেল মনে। বিলুর আত্মচিন্তা—"আশ্চর্য আমার মনের গতি! কালো রং-এর কথা শুনিয়াই ভাবি ব্ল্যাক জাপান না আলকাতরা? ওয়ার্ডারকে জিজ্ঞাসা করি, আলকাতরা না কি? দড়িটা কিসের? শোনে না কি? নিজের মনের উপর নিজেরই বিদ্রুপ করিতে ইচ্ছা হয়। এখনও কি দড়িটি কিসের তৈরি সেই কথাটি জানাই আমার বেশি দরকার! চিরকাল আমার মনের এই অদ্ভুত গতি আমি লক্ষ্য করিয়াছি।"[৬] শুধু নিজের কথা নয়, ফাঁসির আগের দিন সলিটারি সেলে বসে মা, বাবা, ও নীলুর কথাও বার বার মনে পড়ে। নীলুকে বোধ করি, বিলুর মতো করে কেউ বুঝতে পারে না। "আমি জানি যে নীলু আমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়া নিজের কর্তব্য করিয়াছে। কোন আত্মসম্মানশীল, সত্যনিষ্ঠ, রাজনৈতিক কর্মীর ইহা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। কিন্তু ইহা হইল যুক্তির কথা। সুপ্ত চেতনা হয়তো ভাবে যে এ যুক্তি কোর্টে চলিতে পারে, বই-এ ছাপার কালিতে ইহা দেখিতে ভালো, কিন্তু অন্যত্র ইহার স্থান নাই।"[৭] যে নীলু একটা সময় পর্যন্ত দাদা অন্ত প্রাণ ছিল, সেই নীলু শুধুমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক দলের সদস্য হওয়ার দরুণ দাদার বিরুদ্ধে জবানবন্দী দিচ্ছে। বিলু চলে গেলে মায়ের এক ছেলে বেঁচে থাকবে, মায়ের সে আঘাত কতখানি নিদারুণভাবে বুকে বাজবে সারাজীবন , সেকথাও মনে হয় বিলুর। "--- মা যে ওয়ার্ডে আছেন, তাহার নাম আওরৎকিতা। আজ আর ঘুমাইতে পারিবেন না। মা বোধ হয় মশারি ফেলিয়া জপে বসিয়াছেন। মন খারাপ হইলেই মা দেখিয়াছি , জপে বসেন।"[৮]

বিলুর বাবা ছিলেন আপার ডিভিশন ওয়ার্ডে। চৌত্রিশজন বন্দী রয়েছেন। তার মধ্যে উনিশজন নিরাপত্তা বন্দী, পনেরো জন রাজবন্দী। বিলু-নীলুর বাবা গান্ধীবাদী। আজীবন গান্ধীবাদকে আদর্শ করে জীবন অতিবাহিত করেছেন। তিনি মনে করেন—"এখন যে চরখার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে, ইহা রামরাজ্য ফিরাইয়া আনিবার একমাত্র অস্ত্র। রামরাজ্য হইবে প্রেমের রাজ্য, গৌরাঙ্গের রাজ্য, লোকে হিংসা দ্বেষ ভুলিবে।"[৯] বাবার সঙ্গে ধীরে ধীরে মতাদর্শগত পার্থক্য তৈরি হয়েছে বিলু-নীলুর। কিন্তু তিনি কখনো মনে করেননি --- 'আমার মতের সহিত মেলে নাই বলিয়া তাহার ব্যক্তিত্বের এতটুকু সম্মান যদি আমি না রাখিতে পারি, তাহা হইলে আমাদের পথের সংযম ও সহনশীলতা থাকিল কোথায়?"[১০] এতো গেল আদর্শবাদী

SAMSAPTAK
e-ISSN: Applied for (Online)
OPEN ACCESS An International Multidisciplinary Journal
Double-Blind Peer-Reviewed
(Arts, Social Sciences & Humanities)
Vol.1, Issue- 1, January -2026

পিতার উক্তি। কিন্তু সব কিছুর পরেও তিনি পুত্রসন্তানের পিতা, যার ছেলে ফাঁসির মঞ্চের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে। "আজ রাত্রিটা অন্তত যদি বিলুর কাছে থাকিতে পারিতাম। না, একসঙ্গে না থাকায় ভালোই হইয়াছে। তাহা হইলে হয়তো দুজনের ভাঙ্গিয়া পড়িতাম—তবে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত কথা বলিয়া লইতে পারিতাম..... হয়তো কথাই খুঁজিয়া পাইতাম না।[১১] দুশ্চিন্তার ঘোরে জ্যেষ্ঠ সন্তানের ফাঁসি হওয়ার আগের দিন রাত থেকে বিলুর বাবা আত্মসমীক্ষণে ব্যাপৃত। একবার তার মনে হয়েছে তিনিও যদি তার বাবার মতো সরকারি চাকরি করতেন , আর পাঁচজন গড়পরতা সংসারী মানুষের মতো জীবনযাপন করতেন স্ত্রী সন্তানদের নিয়ে তাহলে আজ তার সন্তানরাও সংসারী হতো। তার চিন্তা নীলু-বিলুর মা-কে নিয়ে--- "আমার তো যাহা হইবার হইল—ভাবনা বিলুর মাকে লইয়াই, সে তো নিশ্চয়ই নাওয়া খাওয়া ছাড়িয়া দিয়াছে। জেলের ভিতর কোনও খবর পৌঁছাইতে কি দেরী লাগে! সব খবরই সে পাইয়াছে। নীলুর সাক্ষ্য দিবার কথাও হয়তো সে জানে। সে কী করিয়া এ আঘাত সহ্য করিবে? "[১২] বাবার চোখে বিলু দায়িত্বজ্ঞানপূর্ণ, বিচক্ষণ। বিলুর ব্যবহারও সুমধুর, অন্যদিকে নীলু উদ্ধত, সর্বদাই উন্মত্ত। সময় যত এগিয়েছে, রাত যত বেড়েছে চিরজীবন শান্ত, ধৈর্যশীল পিতার মনের স্থৈর্য তত ক্ষীণ হয়েছে। সন্তানের মৃত্যুর আশঙ্কায় দগ্ধ পিতার অন্তরের দ্বন্দ্ব অত্যন্ত সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন সতীনাথ—"আবার সুতা ছিঁড়িল। তুলাটাই বোধহয় পুরানো। এতবার সুতা ছিঁড়িলে কি চরখা কাটা যায়? এই পাঁজ দিয়া পূর্বেও সুতা কাটিয়াছি, তখন তো ছেঁড়ে নাই। না, আমার হাত পা কাঁপিতেছে। পাঁজটি ঠিক ধরিতে ও ইচ্ছামতো টানিতে পারিতেছি না।"[১৩] মন শান্ত রাখিতে গান্ধীবাদী বিলুর বাবা চরখাকেই বেছে নিয়েছেন। কিন্তু তার পিতৃহৃদয় সন্তান হারানোর শোকে , আশঙ্কায় নিজেকে স্থির রাখতে অক্ষম।

সতীনাথ ভাদুড়ী মায়ের স্বগতোক্তি সম্পর্কে লিখেছেন--- "বিলুর ফাঁসিতে মার প্রতিক্রিয়া বাবা/নীলুর তুলনায় অনেক বেশি গভীর ও তীব্র। কারণ বাবা,বা নীলু কেবলমাত্র বিলুর সঙ্গে আত্মীয়তার সম্পর্কসূত্রে কাহিনীতে চিত্রিত হয়নি।তারা উভয়েই ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রতিনিধি। কিন্তু মা কেবলই মা।"[১৪] বিলুর মায়ের কোনও রাজনৈতিক পরিসর নেই। তিনি কংগ্রেস করেন কংগ্রেসের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে নয়, স্বামী কংগ্রেসের একনিষ্ঠ কর্মী; স্বামী চান পরিবারের সকলে মহাত্মা গান্ধীর আদর্শে পরিচালিত হয়ে কংগ্রেসে যোগ দিক। স্বামীর মন রাখতেই কংগ্রেসে আর আশ্রমের কাজে নিজেকে জড়িয়ে রাখতেন বিলুর মা। তিনি রাজনৈতিক মতাদর্শের সূক্ষ্ম পার্থক্য বুঝতে পারেন না। স্বামীর সকল প্রকার কাজে কর্মে সাহায্য করা এবং তার মতের বিরুদ্ধাচারণ না করাই তার কর্তব্য। স্বাভাবিক সংসারজীবন পরিত্যাগ করে দেশমাতৃকার কাজে নিজেকে আত্মনিয়োগ করলেও বারে বারে তাঁর পূর্বের সংসারের কথাই মনে পড়েছে। প্রাবন্ধিক অরূপ কুমার ভট্টাচার্য্য বলেছেন—" মায়ের চরিত্রটি রূপায়ণের মধ্য দিয়ে তিনি অসাধারণ পরিমিতিবোধের পরিচয় দিয়েছেন। এমন নিখুঁত পারিবারিক চিত্র সচরাচর বাংলা উপন্যাসে দেখা যায় না।"[১৫]

'আওরৎ কিতা'-য় বসে বিলুর মা ফাঁসির পূর্বরাত্রে সকলের মতো আসন্ন ভয়ঙ্কর মুহূর্তের জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে আছেন। বিলু ৪২ এর আন্দোলনে রাষ্ট্র দ্রোহিতার অপরাধে ফাঁসির আসামী। বিলুর অপরাধের গুরুত্ব তিনি

SAMSAPTAK
e-ISSN: Applied for (Online)
OPEN ACCESS An International Multidisciplinary Journal
Double-Blind Peer-Reviewed
(Arts, Social Sciences & Humanities)
Vol.1, Issue- 1, January -2026

জানেন। তিনি বিলুর প্রাণদণ্ডের সম্ভাবনায় অস্থির হয়ে পড়েছেন, তারই আর এক ছেলে নীলু দাদার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য বিলুর আজ ফাঁসি হতে চলেছে, মা হয়ে একথা তিনি বিশ্বাস করেন কি করে? একদিকে এক সন্তানের আসন্ন বিপদ, অপরদিকে আর এক সন্তানের প্রতি অবিশ্বাসের সূচনা—এই দুইয়ের দ্বন্দ্বে আন্দোলিত বিলুর মায়ের চরিত্রটি লেখক অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে অঙ্কিত করেছেন।

গ্রন্থের মধ্যে নীলু চরিত্রটি আংশিকভাবে অস্পষ্ট থেকে গেছে। নীলু কমিউনিস্ট দলের সদস্য হওয়া সত্ত্বেও তার কথায় ও কাজে সব সময় সংগতি রক্ষিত হয়নি। প্রাবন্ধিক অরূপ কুমার ভট্টাচার্য্য নীলু চরিত্রটি প্রসঙ্গে বলেছেন—" 'জাগরী' উপন্যাসে লেখক নীলু চরিত্র পরিকল্পনাতেই অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছেন। প্রথমতঃ নীলু যে রাজনৈতিক মতাদর্শে বিশ্বাস করে তাতে দেশে যথার্থ স্বাধীনতার অর্থ বিদেশী শক্তির হাত থেকে কেবল ক্ষমতা দখল নয়, সেইসঙ্গে দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোর আমূল সংস্কার করে শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা করাও তাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের অঙ্গ।"[১৬] নীলুর বিশ্বাস পার্টি সব কিছুর ঊর্ধ্বে। এই আত্ম অহংকারে রাজসাক্ষী হয়ে তার দাদাকেই পুলিশের হাতে ধরিয়ে দিল। হিংসাত্মক কাজে অংশগ্রহণ ও নেতৃত্বদানের কারণে বিলুর ফাঁসির আদেশ হল। কিন্তু নীলু দাদা অন্ত প্রাণ। রাজনৈতিক মতাদর্শগত পার্থক্যের বাইরে নীলু দাদার অনুসরণকারী ছোটবেলা থেকে। সেই নীলু আজ সমাজের চোখে ভ্রাতৃহন্তা। মায়ের দিকে চোখ তুলে কথা বলতে পারার ক্ষমতা তার নেই। নীলুর অন্তরের যন্ত্রণা খুব সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন উপন্যাসের শেষ দিকে। অঘোরবাবুকে জেলের বাইরে ভোর রাতে দাঁড়িয়ে থাকার কারণ জানাতে গিয়ে গলা ধরে আসে নীলুর। "না ইন্টারভিউ-এ আসিনি। এসেছিলাম আজ দাদার ইয়ে আর কথা বাহির হয় না। ঠোঁট কাঁপিতেছে, কিন্তু কথা বাহির হইতেছে না; কে যেন দৃঢ় হস্তে গলাটি চাপিয়া ধরিয়াছে। আমার চোখেও জল আসিয়া গেল। অন্যদিকে তাকাইয়া কোনোরকমে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের চিঠিখানা তাঁহাকে দিই।"[১৭] পরে জানা যায় বিলুর ফাঁসি রদ হয়েছে। প্রবল উত্তেজনার নিরসনে উপন্যাসটি শেষ হয়েছে।

রাজনৈতিক উপন্যাস রচনার মধ্য দিয়েই সতীনাথ ভাদুড়ীর সাহিত্য জীবনে অনুপ্রবেশ ঘটেছিল। তাঁর 'জাগরী' উপন্যাসটি স্বাধীনতা আন্দোলনের পটভূমিতে রচিত সার্থক রাজনৈতিক উপন্যাস। উপন্যাসটির মধ্যে লেখকের অসামান্য শক্তিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। জনমানসে রাজনৈতিক চেতনার এমন সূক্ষ্ম এবং স্বাভাবিক বিকাশ সচরাচর কোনও গ্রন্থে চোখে পড়ে না। কারা উপন্যাস এবং সেইসঙ্গে মনস্তাত্ত্বিক টানাপোড়েন 'জাগরী' উপন্যাসে দেখেছি। তেমনই আরও একটি কারা উপন্যাস একবিংশ শতকে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে, একাধিক পুরস্কারে পুরস্কৃত হয়েছে—সেটি হল জয়া মিত্রের 'হন্যমান'। এই প্রবন্ধে দ্বিতীয় কারা উপন্যাস হিসাবে এবং 'জাগরী' যে মাইল ফলক তৈরি করেছে তারই ধারা বহন করেছে 'হন্যমান'।

লেখিকা জয়া মিত্র সাতের দশকে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলে বন্দী হয়ে সাড়ে চার বছর কাটিয়েছেন। সেই অভিজ্ঞতাই ধরা পড়েছে 'হন্যমান' উপন্যাসে। সাহিত্যিক অমিতাভ গুপ্ত লিখেছেন –" বর্তমান গ্রন্থটি প্রকৃতপক্ষে তাঁর ব্যক্তিগত বন্দিজীবনের স্মৃতিমাত্র নয়, ব্যক্তি মানুষের যন্ত্রনার সীমাকে ছাড়িয়ে সমগ্র মানব

SAMSAPTAK
e-ISSN: Applied for (Online)
OPEN ACCESS An International Multidisciplinary Journal
Double-Blind Peer-Reviewed
(Arts, Social Sciences & Humanities)
Vol.1, Issue- 1, January -2026

পটভূমির আর্তির অপরিসীমে ব্যাপ্ত হয়েছে এর সংকেত। সাড়ে চার বছর পর মুক্তি পেয়েছিলেন ঠিকই কিন্তু জেলের প্রাচীরের ভিতরে যে হিংস্রতা ছায়া বিস্তার করে আছে তাঁর সম্পর্কে তিনি লিখলেন যখন মুক্তি পেলেন। শ্মশান ও পুনরায় ঘাসজমি হয়ে ওঠা শান্তি ফিরে এলে, যারা কারা প্রাচীরের বাইরে এসে দাঁড়ালেন, তাদের অনেকে লিখলেন জীবনের সেই অন্ধকার অংশের কথা – অত্যাচার, পাশবিকতা, হত্যা ও নির্মম বীভৎসতার সেই সব স্মৃতি।"[১৮] জেলে কাটানো এই কয়েকটা বছর অনেক কিছু শিখিয়েছে। অনেক নতুন জীবনের সঙ্গে পরিচয় করিয়েছে। এক নতুন পৃথিবীকে দেখেছেন। তাই বলেছেন—" নরকের মধ্যে দাঁড়িয়েও মানুষের সাহস তার ভালোবাসা—সেখান থেকে , এমনকি মৃত্যুর মধ্যে দিয়েও অপ্রতিরোধ উঠে আসছে জীবন।"[১৯] এই কয়েকটা বছর জেলে না কাটালে 'মানুষ' কথাটির অর্থই অজানা থেকে যেত লেখিকার কাছে। এমনই ধারণা তাঁর। জেলে থাকাকালীন সেই জগতের চেনা মুখগুলির প্রতি তাঁর দায়বদ্ধতা ছিল। গঙ্গা, জয়লক্ষ্মী , মায়া, ইতোয়ারী, হানিফা, আয়তামাঈ, বাপীদি, মালা, ময়না, নূরজাহান আরো কত বন্দীদের বন্দিত্ব বরণের পেছনের করুণ কাহিনি এবং জেলের অন্দরের নিদারুণ অত্যাচার বীভৎসতার কাহিনি 'হন্যমান'।

লেখিকাকেও অসুস্থ অবস্থাতেই মেদিনীপুরের সেন্ট্রাল জেলে নিয়ে যাওয়া হয়। সে নিয়ে যাওয়ার দৃশ্যও ভয়াবহ। স্ট্রেচারে চ্যাংদোলা করে গাড়িতে তুলে দেওয়া হয়। গাড়িতে ফেলে রাখা হয় সিটের নীচে। জ্ঞান আসে যখন তিনি জেল হাসপাতালে। মেদিনীপুরের জেলের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন—" মেদিনীপুর জেলটা চমৎকার। কেননা প্রথমত এখানে আমাকে একা বন্ধ করে রাখা সম্ভব নয়। একটা মস্ত বড় উঠানের দুপাশে দুটো বড় ওয়ার্ড, আলাদা রাখবার কোনো ব্যবস্থাই নেই। সুতরাং আমরা আটজন থাকি একটা বড় ঘরে। এছাড়া বড় বড় গাছপালা, প্রশাসনের খানিকটা ঢিলেঢালা ভাব এবং প্রচুর সংখ্যায় সাঁওতাল মেয়েদের উপস্থিতি, যারা প্রধানত রেল ইয়ার্ডের ধার থেকে কয়লা চুরি করার অপরাধে জেলে আসে, সব মিলিয়ে মেদিনীপুর জেলের মেয়েদের ওয়ার্ডে গ্রামীন আবহাওয়া প্রবল।"[২০] এই জেলে থাকতে থাকতে বুঝতে পারেন ন্যূনতম ব্যবস্থা নেই মহিলা ওয়ার্ডে। পুরো ফিমেল ওয়ার্ডে একটি মাত্র কল, সেটাও হাসপাতালে। দিনে মাত্র আধ ঘন্টার মতো জল আসে সেখানে। চারজনের জন্য একটিমাত্র কলসি।স্নানের ব্যবস্থাও অস্বাস্থ্যকর। মেয়েরা দল বেঁধে নেমে কোনও মতে গা ভেজায়। আর সপ্তাহে একদিন কাপড় কাচার জন্য গামলায় সোডা দেওয়া হয়। সেদিন আর স্নান হয় না।

শুধুমাত্র জেলে ফিমেল ওয়ার্ডের করুণ ছবি দেখি তা নয়, সেইসঙ্গে শোচনীয় কাহিনি রয়েছে এক একজন বন্দিনীর জীবনে। যেমন জয়লক্ষ্মীর কাহিনি কোনো অপরাধ না করেও সে জেলে। বিয়ের পর জয়লক্ষ্মীকে ঘরে রেখে শাশুড়ি চলে যায়, স্বামীও আট মাসের মেয়েকে নিয়ে ধোপাবাড়ি যাওয়ার নামে যায় আর ফেরেনি। মেয়েটাকে নিয়ে কোথায় গেল খোঁজ করতে গিয়ে রাস্তায় ঘুরতে ঘুরতে ধর্ষিতা হয় এবং তারপর থেকে জেল হেফাজতে সে।

SAMSAPTAK
e-ISSN: Applied for (Online)
OPEN ACCESS An International Multidisciplinary Journal
Double-Blind Peer-Reviewed
(Arts, Social Sciences & Humanities)
Vol.1, Issue- 1, January -2026

জেলে আলাপ হয় আর একটি মেয়ের সঙ্গে , নাম গঙ্গা। তাকেও বিয়ের পর সহ্য করতে হয়েছে স্বামীর সঙ্গে ভাগ্নীর সম্পর্ক। তার উপর স্বামীর অত্যাচার। শান্তবালার ও একই রকম করুণ কাহিনী। তেরো বছর ধরে নিরন্তর মার খেতে খেতেই এগারোটা ছেলে মেয়ের মা হয়েছে। শেষে অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে স্বামীকে বিষ খাইয়ে মেরে নিজেই জেলে আসে। জেলে ছোট খাটো জিনিস পেয়েই তারা কত খুশি। শান্তা তার দীর্ঘদিনের জমিয়ে রাখা সর্ষের তেল নিয়ে আসে, তাই দিয়ে ভাত মেখে খাবে বলে। শিবরাত্রির দিন মাথা পিছু মেয়েরা এক চামচ চিনি, দুমুঠো সাবু আর কড়ে আঙ্গুলের মাপে একটা কলা পায়। পুষ্পা নেইয়ার পায়ে ইটের টুকরো খোঁচায় ইনফেকশন হয়ে যায়। ক্ষত স্থানে পোকা হয়ে যায়। এতোটাই অবহেলা অযত্ন বন্দীদের প্রতি। এর সঙ্গে উঠে এসেছে কুসংস্কারের কাঁটা যে যন্ত্রণায় বিদ্ধ অন্ত্যজ সমাজের মেয়েরা। বুধার

দু'বার বিয়ের পরেও সন্তান আসেনি। এর সমাজ বলে ডাইনীর নজরে ওর প্রজনন ক্ষমতা নষ্ট হয়ে গেছে। ফুলমালা বর্মনের একই রকম কাহিনি। তেরো বছর বয়েসে বিয়ে আর প্রাপ্তি শারীরিক নির্যাতন, 'হাঘরে' মেয়ের লাঞ্ছনা আর দুটি সন্তান। 'এক সর্বনাশা মুহূর্তের রাগে, ক্ষোভে অসহায় ক্রোধে বাচ্চা দুটোকে বিষ খাইয়ে নিজের গলায় হাঁসুয়া চালিয়ে পড়ে ছিল খেতের আলে।'[২২] কপালের লিখনে খেত পার হচ্ছিল গ্রামের লোক, সন্তান খুনের দায়ে ফুলমালা আজ জেলে। শ্যামবাঈ, রাজশ্রী, নিভা, মীনাক্ষী আরো অনেকের কাহিনি 'হন্যমান'। শ্যামবাঈ অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় লক আপে বন্দী ছিল। সন্তান প্রসবের সময় তাকে হাসপাতালে পাঠানো হয়। কিন্তু তার জায়গা হয়েছে একটি ভাঙা খাট যাতে তোষক ও দেওয়া হয়নি। সদ্য ভূমিষ্ট সন্তান সেই ভাঙা জায়গা দিয়ে পড়েই মারা যায়। "শ্যামবাঈ ক্লান্ত কান্না ভাঙা গলায় ওয়েল ফেয়ার অফিসারকে বলেছে বাচ্চা জন্মে কেঁদেছিল। তারপর শ্যামবাঈ একা একা নিজেই কোনরকমে বাড়ি থেকে আনানো বাঁশের চাঁচ দিয়ে নাড়ি কাটতে তার হাত পিছলে ভাঙা জায়গাটা দিয়ে বাচ্চা নিচে পড়ে মরে গেছে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা শ্যামবাঈ বলেছে- " অনেক সময় অনেকেই জিজ্ঞেস করেন জেলে খুবই কষ্ট দিত? অত্যাচার করত? সাধারণতঃ হেসে এড়িয়ে যাই- জেলে কি আর লোককে আদর যত্ন করার জন্য নিয়ে যায়? অত্যাচার কষ্ট এসব শব্দের মানে কি ভালো করে জানি আমরা?"[২২]

এই উপন্যাসের প্রত্যেকটি মেয়ে আসলে হন্যমান। হন্যমান অর্থ আক্রমণ করা হচ্ছে যাকে। সেই অর্থে লেখিকা হন্যমান, হন্যমান শ্যামবাঈ, হন্যমান বরদা, গঙ্গা, পুষ্পা ও অন্যান্যরা। ঔপন্যাসিক জয়া মিত্র এঁদের কথা বলেছেন কারণ এদের হয়ে কথা বলার কেউ নেই। এদের কষ্ট অনুধাবন করার কেউ নেই। জয়া মিত্র অত্যন্ত দরদী ভাষায় তাই এদের কথা লেখেছেন এবং স্পষ্ট করেই দিয়েছেন – "ভিতরের দিকের ছায়ার হিংস্রতার যে প্রকট রূপ তারই অভিজ্ঞান নিয়ে কয়েকটি চরিত্র এসেছে এ গ্রন্থে, হয়তো তারা আবার মিলে গিয়েছে আমাদের প্রতি মুহূর্তের জ্ঞাত বা অজ্ঞাত শৃঙ্খলের দৃঢ়তায়।"[২৩]

কারা উপন্যাস মানেই রাজনৈতিক ঘটনার প্রেক্ষাপটে কারাগারের অন্দরে বন্দীদের চেতনা প্রবাহমানতার কাহিনি। সতীনাথ ভাদুড়ীর 'জাগরী' ছিল একই পরিবারে চারজনের চেতনা প্রবহমানতার কথা একটি

SAMSAPTAK
e-ISSN: Applied for (Online)
OPEN ACCESS An International Multidisciplinary Journal
Double-Blind Peer-Reviewed
(Arts, Social Sciences & Humanities)
Vol.1, Issue- 1, January -2026

ঘটনার প্রেক্ষিতে, অন্যদিকে 'হন্যমান' উপন্যাসে সত্তরের দশকে কারাগারে বন্দীদের প্রতি হওয়া অত্যাচার, নিপীড়নের কাহিনী বর্ণিত। দুটি উপন্যাসেই রাজনৈতিক প্রেক্ষিত বর্তমান। 'জাগরী'তে যেমন মনস্তাত্ত্বিক টানাপোড়েন বেশি 'হন্যমান' উপন্যাসে বাহ্যিক ঘটনার প্রেক্ষিতে মানসিক ও দৈহিক ঘাত প্রতিঘাত বর্ণিত।

References

তথ্যসূচি-

১। Hoe, Irving- 'Politics and the Novel' A horizon Press Book, New York, April 1957, page: 15

২। বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজ- 'বাংলা উপন্যাসে কালান্তর' দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা নভেম্বর ২০১৬, পৃঃ ৩১০

৩। ভাদুড়ী, সতীনাথ- 'জাগরী' প্রকাশ ভবন, কলকাতা, পঞ্চদশ মুদ্রণ, বৈশাখ, ১৩৯০, পৃঃ ভূমিকা।

৪। মিত্র, জয়া- 'হন্যমান' দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা,৭৩ আগস্ট ১৯৯৪, পৃঃ ভূমিকা।

৫। গঙ্গোপাধ্যায়, সুবল- 'সতীনাথ স্মরণে' ভারতী ভবন, পাটনা, নভেম্বর ১৯৭২, পৃঃ ১৭।

৬। ভাদুড়ী, সতীনাথ- 'জাগরী' প্রকাশ ভবন, কলকাতা, পঞ্চদশ মুদ্রণ, বৈশাখ, ১৩৯০, পৃঃ ১১।

৭। ভাদুড়ী, সতীনাথ- 'জাগরী' প্রকাশ ভবন, কলকাতা, পঞ্চদশ মুদ্রণ, বৈশাখ, ১৩৯০, পৃঃ ৪৫।

৮। ভাদুড়ী, সতীনাথ- 'জাগরী' প্রকাশ ভবন, কলকাতা, পঞ্চদশ মুদ্রণ, বৈশাখ, ১৩৯০, পৃঃ ৩১।

৯। ভাদুড়ী, সতীনাথ- 'জাগরী' প্রকাশ ভবন, কলকাতা, পঞ্চদশ মুদ্রণ, বৈশাখ, ১৩৯০, পৃঃ ৭২।

১০। ভাদুড়ী, সতীনাথ- 'জাগরী' প্রকাশ ভবন, কলকাতা, পঞ্চদশ মুদ্রণ, বৈশাখ, ১৩৯০, পৃঃ ৭৩।

১১। ভাদুড়ী, সতীনাথ- 'জাগরী' প্রকাশ ভবন, কলকাতা, পঞ্চদশ মুদ্রণ, বৈশাখ, ১৩৯০, পৃঃ ৯৬।

১২। ভাদুড়ী, সতীনাথ- 'জাগরী' প্রকাশ ভবন, কলকাতা, পঞ্চদশ মুদ্রণ, বৈশাখ, ১৩৯০, পৃঃ ১০০

১৩। ভাদুড়ী, সতীনাথ- 'জাগরী' প্রকাশ ভবন, কলকাতা, পঞ্চদশ মুদ্রণ, বৈশাখ, ১৩৯০, পৃঃ ১০৬

১৪। মৈত্রেয়ী ঘোষ : সতীনাথ ভাদুড়ী : আধুনিক বাংলা উপন্যাসের একটি অধ্যায়, মর্ডান কলম, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ, ১৯৮৫ পৃঃ ১১৪

১৫। ভট্টাচার্য, অরূপ কুমার- 'সতীনাথ ভাদুড়ীঃ জীবন ও সাহিত্য' পুস্তক বিপণি, কলকাতা ০৯, প্রথম প্রকাশ ১৩৯১, পৃঃ ১৪৫।

১৬।ভট্টাচার্য, অরূপ কুমার- 'সতীনাথ ভাদুড়ীঃ জীবন ও সাহিত্য' পুস্তক বিপণি, কলকাতা ০৯, প্রথম প্রকাশ ১৩৯১, পৃঃ ১৪৭।

১৭। ভাদুড়ী, সতীনাথ- 'জাগরী' প্রকাশ ভবন, কলকাতা, পঞ্চদশ মুদ্রণ, বৈশাখ, ১৩৯০, পৃঃ ১৯৯

১৮। গুপ্ত, অমিতাভ- 'হন্যমান', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, আগস্ট ১৯৯৪, পৃঃ ভূমিকা।

১৯। মিত্র, জয়া - 'হন্যমান', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, আগস্ট ১৯৯৪, পৃঃ ভূমিকা।

২০। মিত্র, জয়া - 'হন্যমান', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, আগস্ট ১৯৯৪, পৃঃ ভূমিকা।

SAMSAPTAK
OPEN ACCESS
e-ISSN: Applied for (Online)
An International Multidisciplinary Journal
Double-Blind Peer-Reviewed
(Arts, Social Sciences & Humanities)
Vol.1, Issue- 1, January -2026

২১। মিত্র, জয়া - 'হন্যমান', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, আগস্ট ১৯৯৪, পৃঃ ১৫-১৬।
২২। মিত্র, জয়া - 'হন্যমান', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, আগস্ট ১৯৯৪, পৃঃ ৪৭।
২৩। মিত্র, জয়া - 'হন্যমান', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, আগস্ট ১৯৯৪, পৃঃ ১২৫।
২৪। মিত্র, জয়া - 'হন্যমান', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, আগস্ট ১৯৯৪, পৃঃ ১২৫।
২৫। গুপ্ত, অমিতাভ- 'হন্যমান', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, আগস্ট ১৯৯৪, পৃঃ ভূমিকা।